ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?

- অপার্থিব জামান

E-mail: aparthib@yahoo.com

ধর্মে বিশ্বাসীরা একটা দাবী প্রায়ই করে থাকেন যে ন্যয় অন্যয় এর সংজ্ঞা কেবল ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদের মাধ্যমেই দেয়া সম্ভব। ধর্মই নৈতিকতার উৎস। তাদের মতে যারা ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মে অবিশ্বাসী তাদের কোন স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধ থাকতে পারেনা। এখানে ধর্মবিশ্বাস বলতে সৃষ্টিকর্তা ও ধর্মীয় পুস্তকে বিশ্বাস বোঝান হচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসীরা দাবি করে যে নৈতিকতা কখনই ধর্মে বিশ্বাস ছাড়া অর্জন ও বলবৎ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মানবতাবাদীরা বা যুক্তিবাদীরা কখনই দাবি করে না যে ধর্ম দ্বারা নৈতিকতা বলবৎ করা সম্ভব নয়। তারা শুধু এটাই বলে যে ধর্ম ছাড়াও নৈতিক চিন্তা বা আচার ব্যবহার এর অধিকারী হওয়া সম্ভব। নৈতিকতা ধর্ম প্রদত্ত নয়, বরং তা মানুষেরই সৃষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে যার কিছুটা ধর্মে প্রতিফলিত হয় মাত্র, কারন ধর্মও মানুষেরই সৃষ্টি।
তারা আরও বলেন যে ধর্মে বিশ্বাস সত্তেও নৈতিকতার অভাব থাকতে পারে। এর প্রমাণ বাস্তবেই পাওয়া যায়। বিষয়টা গুছিয়ে বোঝান যাক নিম্নে :

১। একটা ব্যতিক্রমই কোন নিয়ম ভুল প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ঠ।
২। ধর্মবিশ্বাসীরা এটাকে একটা অমোঘ নিয়ম বলে দাবি করে যে নৈতিকতা কখনই ধর্মে বিশ্বাস ছাড়া ব্যক্তি বা সমাজে বলবৎ করা সম্ভব নয়।
৩। এমন অনেক ব্যক্তি বা সমাজ দেখা যায় যারা ইশ্বর ভিত্তিক ধর্মে বিশ্বাসী নয়, অথচ নৈতিকতাহীন ও নয়, যেমন বৌদ্ধ সমাজ, বা বিখ্যাত অনেক নাস্তিক মনীষী। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উপরের ২ নং এর অমোঘ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কাজেই নিয়মটি ভুল ।

গোড়াতেই একটা অবিসংবাদিত সত্য উল্লেখ করি। আর সেটি হল:

নীতিহীন নাস্তিকও যেমন আছে, তেমনি নীতিহীন আস্তিক ও আছে। আবার
নীতিবান আস্তিক ও যেমন আছে, তেমনি নীতিবান নাস্তিকও আছে।

নীতিহীন আস্তিক সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাসীরা অবশ্য বলবেন যে, 'লোকটা যদি সত্যিই ধর্মে খাঁটি বিশ্বাসী হত তাহলে কখনই নীতিহীন হত না। নীতিহীনতা তার ধর্মে বিশ্বাসের অভাবের ই প্রমাণ'। এর উত্তরে বলা যায় যে লোকটি ধর্মে খাঁটি বিশ্বাসী কি না সেটা মুখ্য ব্যাপার নয়, মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে যে সে 'নাস্তিক' নয়। আর আস্তিক হওয়া অর্থই ধর্মে বিশ্বাসী । নীতিহীন হয়ার কারনেই তাকে ধর্মে অবিশ্বাসী বলাটা হবে সুবিধাবাদী যুক্তি। কার্যের পরে কারণ খোঁজা।

অনেকে বলে থাকেন যে একমাত্র কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও নৈতিকতা বজায় রাখা যায়, যদি সবাই ধর্মীয় নীতিমালা মেনে চলে। এর প্রত্যুত্তরে এটাও বলা যায় যে লোকায়ত রাষ্ট্রীয় আইন কঠোর ভাবে বলবৎ করলে এবং সবাই তা মেনে চল্লেও সমাজ অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত হতে পারে। কোন ধর্ম শাসিত রাষ্ট্র অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত হলে এটা প্রমানিত হয় না যে জনগন ধর্মে গভীর বিশ্বাসের দরুন ই অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে বিরত থাকছে। এটাই প্রমানিত হয় যে ধর্মীয় অনুশাসন কঠোর ভাবে বলবৎ করা হচ্ছে। অন্য কথায় বলা যায় যে আল্লা বা ইশ্বরের ভয়ে নয়, মানুষের (আইন প্রয়োগকারী) ভয়েই তারা অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে বিরত থাকছে। যদি ধর্মীয় আইন প্রয়োগে কোন শৈথিল্য হয় বা আইন মেনে চলাটা স্বেচ্ছামূলক করে দেয়া হয় জনগনের বিবেকের উপর আস্থা রেখে তাহলে সমাজে দুর্নীতি আর অপরাধ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে বাধ্য। ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা মানুষের অন্তরের অশুভ প্রবৃত্তি দূর করা যায়না। যায় শুধু তাকে চেপে রাখা। ধর্মীয় অনুশাসন বা বিশ্বাসের ওপর ভর করা নৈতিকতার ভিত্তি কখন ই দৃঢ় হতে পারে না। ধর্মীয় আইন বা বিশ্বাসে শৈথিল্য হলে নৈতিকতার ও অভাব দেখা দেয়। লোকায়ত আইনে শৈথিল্য হলেও নৈতিকতার অভাব দেখা দেয়। একই কথা সত্য লোকায়ত আইনের বেলায়। অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসন বা বিশ্বাস নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় নীতিগতভাবে লোকায়ত শ্বাসনের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী নয়। আসলে ন্যয় অন্যয় বা ভাল মন্দের ধারনা অর্থাৎ বিবেক মানুষের স্বজ্ঞাত (Intuitive) এক সহজাত প্রবৃত্তি। আর সব সহজাত প্রবৃত্তির মত এটাও বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান (evolutionary psychology) এর নিয়মেই উদ্ভুত লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের পরিণতি হিসেবে। বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান আবার বিবর্তনী জীববিদ্যার এক অঙ্গ। তাই মানুষের বিবেকের মূলেই আছে জীববিদ্যার অমোঘ নিয়ম, যা আবার চূড়ান্ত বিচারে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক বিধিরই অভিপ্রকাশ।

বিবর্তনী জীববিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) সেই সব সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটায় যা প্রজাতির উদ্বর্তন ও বিস্তারে সহায়ক হয়। আর বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের বিবেকের উৎপত্তি ও বিকাশ মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনেরই অভিপ্রকাশ। জীববিদ্যার ভাষায় বলা যায় যে বিবেক হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্কের (Limbic System) সৃষ্ট আদিম প্রবৃত্তির ওপর উর্ধ্ব মস্তিষ্কের কর্টেক্স নামক অঙ্গের নিবারক ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের অনেক পর্যবেক্ষণেই দেখা গেছে যে কর্টেক্স এর ক্ষতি হলে মানুষ তার বিচার বিবেক হারিয়ে ফেলতে পারে, যদিও সে অন্য সব কাজ কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই চালিয়ে যায়। আধুনিক বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী মস্তিষ্কের বর্তমান বিবর্তন হচ্ছে জীন এবং সংস্কৃতির সহবিবর্তনের (Gene Culture Coevolution) এর কারণে।

যাহোক জটিলতায় না গিয়ে এটাই বলা যথেষ্ঠ যে মানুষ ও তার মস্তিক যদি জীববিদ্যার নিয়মে (বা আরো মৌলিক অর্থে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে) উদ্ভূত ও বিবর্তিত হয়; তাহলে মানুষের বিবেকও সেই একই নিয়মেই উদ্ভূত ও বিবর্তিত, কারণ বিবেক মানুষ ও মস্তিষ্কের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিবেকের স্বজ্ঞাত ধারনা ধর্মের আগমনের অনেক আগে থেকেই বিরাজমান ছিল। তাই এটা বলা ভুল হবে যে বিবেক ধর্ম বা ইশ্বর প্রদত্ত। খ্রীষ্ঠান ও ইসলাম ধর্মের অনেক আগেই গ্রীকরা নৈতিকতা নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছিল। কনফুসিয়াস ও বুদ্ধ ইশ্বর কে না টেনেই নৈতিকতা প্রচার করেছিলেন। তা ছাড়া এটা সহজেই বোঝা যায় যে নৈতিকতার উৎস যদি ইশ্বরেই নিহিত তাহলে মস্তিষ্কের জটিলতা ও বিবর্তন এবং বিচার বুদ্ধির পেছনে তার অবিসংবাদিত ভূমিকা নেহাত ই অনাবশ্যক ও বাড়তি হয়ে পড়ে। ভাল মন্দের বিচার কে ইশ্বর ভিত্তিক করা যে ভ্রান্তিপূর্ণ সেটা বোঝা যায় সহজেই। ধর্মবিশ্বাসীরা বলেন যে ইশ্বর যা নিষেধ করেন তাই মন্দ, আর যা আদেশ করেন তাই ভালো। তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় ইশ্বর কেন একটি কাজকে পাপ ঘোষনা করেন, যেমন, ধর্ষন, খুন ইত্যাদি? এর উত্তরে ধর্মবিশ্বাসিদের এটাই শুধু বলতে পারেন যে ইশ্বর যেহেতু পুণ্যের উৎস, তিনি কখন ই পাপ কাজকে অনুমোদন বা উৎসাহিত করতে পারেন না। অর্থাৎ নিজের অজ্ঞাতেই তারা স্বীকার করে নেন যে পাপ এর ধারণা স্বতন্ত্র, ইশ্বর নির্ভর নয়। কারণ পাপ বা মন্দের সংজ্ঞাই যদি হয় যে ইশ্বর যা নিষিদ্ধ বা নিরুৎসাহিত করেন, তাহলে ইশ্বর কখন ই পাপ কে অনুমোদন বা উৎসাহিত করতে পারেন না, এটা বলাটা অসার বাক্য বা দ্বিরুক্তিরই (tautology) সামিল। তাই ইশ্বর নির্ভর পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা এক চক্রাকার সংজ্ঞা ।

এটা স্পষ্ট যে ধর্ম নরকের শাস্তি বা স্বর্গের পুরস্কারের কথা বলে সরল মনাদের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক কার্যকরী নিবারক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু আগেই বলেছি যে লোকায়ত সমাজের লোকায়ত আইন এর সুষ্ঠু প্রয়োগও কার্যকরী নিবারক হিসাবে কাজ করতে পারে। কোন ক্ষীণ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি জনসমক্ষে লুঠ বা ধর্ষণ না করার কারণ এই নয় যে ধর্মে তা নিষিদ্ধ, বরং তা না করার কারণ গ্রেপ্তার বা শাস্তির ভয়। আগেকার দিনে আইনের শাসন ছিলনা বা কার্যকরী রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের অভাবে প্রয়োগ হতনা বলেই ঐশ্বরিক বিধানের নামেই মানুষ অপরাধের নিবারক সৃষ্টি করেছিল। যদি ও এর ব্যতিক্রম ও আমরা দেখেছি, যেমন কনফুসিয়াসের সময়কার চীনে এবং বুদ্ধের বাণীতে। প্রাচীন ইংকা ও মায়া জনগন ও দৈব বাণীর ওপর নির্ভর না করেই এক নৈতিক সমাজের পত্তন করেছিল।

নৈতিকতা অনেকের কাছে একটা সহজাত গুণ, তারা ধর্ম বিশ্বাস বা বিধানের কারণে সৎকাজে লিপ্ত হন না । স্বর্গের পুরস্কারের লোভে বা নরকের শাস্তির ভয়ে ভালো কাজ করা বা মন্দ কাজ না করা আর বিবেকের কারণে ভালো কাজ করা বা মন্দ কাজ না করা সমান প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না। নরকের ভীতির দ্বারা আনুগত্য আনা যায়, কিন্তু নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আগেই উল্লেখ করেছি যে পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যেখানে জনগনের এক বিরাট অংশ ইশ্বর বা ইশ্বরের প্রেরিত পুরুষ এ বিশ্বাস করেন না এবং সরকার ও লোকায়ত আইনের দ্বারা শাসিত, কিন্তু সেখানে নীতিহীনতা বা অপরাধ তেমন বেশী নেই। দূর প্রাচ্যের দেশ গুলোই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নৈতিক আচরন এবং চেতনা হচ্ছে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর একটা ক্রমবিবর্তমান বৈশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট বিভিন্ন মানুষের সমন্বয়ে গঠিত জনগোষ্ঠী, যেখানে পারস্পরিক মূল্যবোধ ও স্বার্থের সংঘাত অপরিহার্য, সেখানে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করে। সুদীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষণ ও ভ্রমের মাধ্যমে এই ক্রমবিবর্তন ব্যক্তি ও সমাজকে অধিকতর শান্তি ও স্থতিশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ধর্মের আগমন না হলেও মানব সমাজ নৈতিক আচরনমালার উদ্ভব করত প্রয়োযনের তাগিদেই, যেমনটি বেশ কিছু সমাজে দেখা যায় যার উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করেছি। মানুষ প্রমাণ করেছে যে তারা নিজেরাই নৈতিক আচরনমালা তৈরী করতে সক্ষম, ঐশ্বরিক প্রেরনা ছাড়াই, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ তাদের ভিন্ন স্বার্থ আর ইচ্ছার অন্বেষনে নিয়োযিত হতে পারে পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে।

[Aparthib Zaman writes from USA. The article is kept in Mukto-mona web site]